(খ) চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষা ঃ 1946—47 খ্রিস্টাব্দে ছেলেদের জন্য 23টি মেডিকেল কলেজ ও পশুচিকিৎসা সংক্রান্ত কলেজ ছিল। মহিলাদের ছিল 3টি। এই চিকিৎসার ক্ষেত্রে উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা হয় বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে। কংগ্রেস মন্ত্রীসভা আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা-চর্চাকে উৎসাহিত করে।

(গ) বাণিজ্য বিষয়ক শিক্ষা ঃ 1946—47 খ্রিস্টাব্দে মোট 14টি Commercial College ছিল, 296টি Commercial School ছিল।

(ঘ) কৃষি ও কারিগরি বিদ্যায় অনেক বেশি উন্নতি হয়েছিল—

(i) কৃষি ঃ এই সময়ে 12টি নতুন কৃষি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। 1947 খ্রিস্টাব্দে ভারতের মোট 17টি কৃষি প্রতিষ্ঠান ছিল যেখানে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শিক্ষা দেওয়া হত। 1936—37 খ্রিস্টাব্দে এর সংখ্যা ছিল 6টি।

(ii) কারিগরি শিক্ষা ঃ এতদিন পর্যন্ত কারিগরি শিক্ষা খুব অবহেলিত ছিল। এই সময় যুদ্ধের প্রয়োজনে এসব শিক্ষার প্রসার হয়। তাছাড়া শিল্পের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কারিগরি শিক্ষার চাহিদা বাড়ে। 1945 খ্রিস্টাব্দে All India Council of Technical Education স্থাপিত হয়। এই Council বিভিন্ন বিষয়ে All India Board of Technical Studies স্থাপন করেন। এই বিষয়গুলি হচ্ছে চারুকলা, স্থাপত্য বিদ্যা, আঞ্চলিক পরিচালনায় Metallurgy, Chemical Engineering ও Textile Technology।

বুনিয়াদি শিক্ষা (Basic Education–1937) ঃ

ভারতবর্ষের প্রাথমিক শিক্ষার ইতিহাসে বুনিয়াদি শিক্ষা কর্মসূচি এক যুগান্তকারী ঘটনা। ইংরেজ শাসিত ভারতবর্ষের ঔপনিবেশিক প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা এবং স্বাক্ষরতার অভাব জাতির জনক মহাত্মা গান্ধিকে পীড়িত করেছিল। 1931 খ্রিস্টাব্দে লন্ডনের গোল টেবিল বৈঠকে মহাত্মা গান্ধি ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার তীব্র সমালোচনা করেছিলেন এবং এর জন্য তিনি ইংরেজ সরকারকেই দায়ী করেন।

ইতিমধ্যে 1935 খ্রিস্টাব্দে ভারত সরকার আইন অনুযায়ী 1937 খ্রিস্টাব্দে জাতীয় কংগ্রেস সাতটি প্রদেশে স্বায়ত্তশাসনের ভার গ্রহণ করেন। ইতিপূর্বে জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে আন্দোলনের একটি প্রধান দাবি ছিল বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় চালু করতে হবে। স্বায়ত্তশাসন গ্রহণ করার পর জাতীয় কংগ্রেসের কাছে প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক করার সুযোগ আসে। কিন্তু প্রশ্ন হল, এর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান কীভাবে হবে। অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলক শিক্ষার পাশাপাশি জাতীয় আন্দোলনের আর একটি দাবি ছিল মদ্যপান বন্ধ করা। আর্থিক দিক থেকে অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা এবং 'মদ্যপান বন্ধ' পরস্পর বিরোধী। মদ্যপানের বিরোধিতায় অর্থের উৎসে ভাটা পড়ে এবং বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক

শিক্ষার জন্য প্রয়োজন হয় প্রচুর অর্থ। এই বিভ্রান্তির মধ্যে মহাত্মা গান্ধি এক নতুন শিক্ষাব্যবস্থার কথা উল্লেখ করেন। যার মূল কথা হল সরকারি কোষাগার থেকে অর্থব্যয় না করে গান্ধিজির মতে, সাত বৎসরের সর্বজনীন অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা চালু করা সম্ভব। শিক্ষাকে এমনভাবে স্বনির্ভর করে তুলতে হবে যেখানে শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনীয় ও উৎপাদনমূলক হাতের কাজ শেখানো হবে যার মাধ্যমে শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান করা সম্ভব হবে। গান্ধিজি এই বৈপ্লবিক শিক্ষাব্যবস্থা 1937 খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'হরিজন' পত্রিকায় প্রকাশ করেন। সেটি পরবর্তী সময়ে বুনিয়াদি শিক্ষা, ওয়ার্ধা কর্মসূচি বলে গণ্য করা হয়।

গান্ধিজির এই পরিকল্পনা শিক্ষিত মহলে প্রচণ্ড বিতর্ক সৃষ্টি করে। স্বাভাবিক ভাবেই এই ব্যবস্থা চালু করার পূর্বে শিক্ষাবিদদের দ্বারা পরীক্ষা করার প্রয়োজনীয়তা দেখা যায়। অতঃপর গান্ধিজির বুনিয়াদি শিক্ষার উপরে ওয়ার্ধা 1937 খ্রিস্টাব্দে অক্টোবর মাসে জাতীয় শিক্ষার প্রথম অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে যেসব প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় তা হল—

(ক) বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষা জাতীয় স্তরে কার্যকারী হবে।

(খ) মাতৃভাষা হবে শিক্ষার মাধ্যম।

(গ) উৎপাদনশীল কাজকে কেন্দ্র করে শিক্ষা কার্যকারী হবে।

(ঘ) শিক্ষার মধ্য দিয়ে শিক্ষকের বেতন দেওয়া হবে।

সম্মেলনে জাকির হোসেনের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠিত হয়, যার দায়িত্ব ছিল উপরোক্ত প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে বুনিয়াদি শিক্ষার একটি পাঠক্রম প্রস্তুত করা। জাকির হোসেনের রিপোর্ট বুনিয়াদি শিক্ষার একটি মৌলিক দলিল বলে গৃহীত হয়।

ইতিমধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। বুনিয়াদি শিক্ষার আন্দোলনে ভাটা পড়ে। কিন্তু এই সময় এমন দুটি ঘটনা ঘটে যার প্রভাব বুনিয়াদি শিক্ষার প্রসার ও মানোন্নয়ন বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হয়।

প্রথমটি হল 1941 খ্রিস্টাব্দে দিল্লির জামিয়ানগরে বুনিয়াদি শিক্ষার উপর দ্বিতীয় সম্মেলন। অপরটি হল 1945 খ্রিস্টাব্দে সেবাগ্রামে অনুষ্ঠিত সম্মেলন। এই সম্মেলনে বুনিয়াদি শিক্ষাকে "জীবনের জন্য শিক্ষা" বলে অভিহিত করা হয়। সম্মেলনে বুনিয়াদি শিক্ষাকে শিক্ষার ক্ষেত্রে এক বিপ্লব বলে চিহ্নিত করা হয় এবং মনে করা হয় এই শিক্ষা ব্যবস্থা সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে ভারতীয় সমাজকে এক নতুন পথের সন্ধান দেবে। এই সময় থেকে গান্ধিজি বুনিয়াদি শিক্ষা 'নঈ তালিম' হিসেবে গণ্য করেন।

জাকির হোসেন কমিটির সুপারিশসমূহ কীভাবে বা স্তবে পরিণত করা যায় তার জন্য বি. জে. খেরের নেতৃত্বে কমিটি গঠন করা হয়। তিনি মন্তব্য করেন, বুনিয়াদি পরিকল্পনায় উৎপাদনের থেকে শিক্ষার উপর গুরুত্ব দিতে হবে।

বুনিয়াদি শিক্ষার উপর গঠিত ঈশ্বরভাই প্যাটেল কমিটি মনে করেন বর্তমান শিক্ষা শহরকেন্দ্রিক, পুথিগত, দৈহিক পরিশ্রমের কোনো সুযোগ নেই। সুযোগের দিক থেকে দরিদ্র এবং সমাজের দুর্বল অংশ বঞ্চনার শিকার। কমিটি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে কোঠারি কমিশন সমর্থিত গান্ধিজি প্রকাশিত কর্মকেন্দ্রিক বুনিয়াদি শিক্ষা জাতির শিক্ষা ব্যবস্থার মূল বিষয় হওয়া উচিত।

শিক্ষার উপরে UNESCO রিপোর্টে 'Learning to be' নামে পরিচিত। প্রাথমিক শিক্ষাকে বুনিয়াদি শিক্ষা বলে অভিহিত করেছে এবং উল্লেখ করেছে শিক্ষা কেবলমাত্র বিদ্যালয়ের মধ্যে আবদ্ধ থাকবে না, বিভিন্ন রকমের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক কর্মসূচি শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত করতে হবে।

খেরের নেতৃত্বে পুনরায় একটি কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটির উদ্দেশ্য ছিল বুনিয়াদি শিক্ষার সঙ্গে উচ্চশিক্ষার সমন্বয় ঘটানো। খেরের নেতৃত্বে দুটি কমিটির সুপারিশ CABE গ্রহণ করে। 1944 খ্রিস্টাব্দে যুদ্ধোত্তর ভারতবর্ষে শিক্ষা-পরিকল্পনায় এই সুপারিশগুলি অন্তর্ভুক্ত হয়। কেন্দ্রীয় ও রাজ্যে প্রায় সমস্ত স্তরে সুপারিশ গৃহীত হয়।

স্বাধীনতার পরে প্রাথমিক স্তরে বুনিয়াদি শিক্ষা পদ্ধতি নিয়েই সরকার প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। নতুন প্রাথমিক স্কুলকে বুনিয়াদি রূপে গড়া এবং পুরোনো স্কুলকে বুনিয়াদি ধরনের ক্রমরূপায়ণের সিদ্ধান্ত হয়। সাধারণ প্রাথমিক স্কুলে হস্তশিল্পকে আবশ্যিক করা হয়। বুনিয়াদি ধরনের বই লেখা ও শিক্ষক-শিক্ষণের ব্যবস্থা করার সিদ্ধান্ত হয়। 1955 খ্রিস্টাব্দে একটি সমীক্ষা কমিটি বুনিয়াদি শিক্ষাকে উচ্চতর শিক্ষার প্রথম ধাপ রূপে (সমস্তরের সাধারণ শিক্ষার সমমর্যাদা দেওয়ার সুপারিশ করেন) ওই শিক্ষার পাঠক্রম, পরীক্ষা, পাঠ্যপুস্তক, হস্তশিল্প এবং সরঞ্জাম প্রভৃতি বিষয়ে গবেষণার জন্য National Institute এবং Basic Education স্থাপিত হয়। জাতীয় শিক্ষা-পরিকল্পনায় বুনিয়াদি শিক্ষার একটি স্থান স্বীকৃত হয়। স্থির হয় যে, সকলকেই নিম্ন বুনিয়াদি শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। তারপর শিক্ষার্থীর সামর্থ্য অনুসারে মাধ্যমিক বা উচ্চ বুনিয়াদি শিক্ষা গ্রহণ করবে। সংবিধানে বলা হল 14 বছর বয়স পর্যন্ত শিক্ষা হবে সর্বজনীন। ভারতের নানা স্থানে বুনিয়াদি বিদ্যালয় ও শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান আরও বেশি সংখ্যায় গড়ে উঠল। আশা করা হল, 14 বছর বয়স পর্যন্ত শিক্ষা সর্বজনীন হবে। অপচয় নিবারণ হবে। শিক্ষার সঙ্গে জীবনের ঘনিষ্ঠ সংযোগ এবং নিজেদের সমস্যা নিজেরাই শিক্ষার্থী সমাধান করতে শিখবে। শিশুকেই শিক্ষা প্রয়াসের কেন্দ্র হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। সামাজিক, অর্থনৈতিক জীবনের সঙ্গে শিক্ষা সংগতিপূর্ণ হবে। শিক্ষার মধ্য দিয়ে জাতীয়তাবোধ, দেশপ্রেম, ধর্মনিরপেক্ষতা, অহিংসা ও আদর্শ প্রসার লাভ করবে।

যদিও কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার সমূহ বুনিয়াদি শিক্ষাকে জাতীয় শিক্ষা হিসাবে গ্রহণ করে তবে বুনিয়াদি শিক্ষা কোনোদিনই তার প্রাপ্য মর্যাদা পায়নি। বুনিয়াদি শিক্ষার

অনেক কিছুই কোঠারি কমিশনের সুপারিশে অন্তর্ভুক্ত হয় যেমন—কর্ম-অভিজ্ঞতা, কমিউনিটি জীবনযাপন, কমিউনিটি কার্যসূচি। জ্ঞানের সঙ্গে অভিজ্ঞতার সমন্বয়, সমস্ত ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া এবং বিশ্ব নাগরিকতা। কমিশন এইগুলিকেই শিক্ষার আধুনিকতা হিসেবে উল্লেখ করেন।

প্রায় তিন দশক পরে 1972 খ্রিস্টাব্দের অক্টোবরে শ্রীমান নারায়ণ (Shriman Narayan) সেবাগ্রামে এক জাতীয় আলোচনা আহ্বান করেন। তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধি সম্মেলনের উদ্‌বোধন করেন। সম্মেলনে প্রায় সব রাজ্যের শিক্ষা মন্ত্রীগণ, অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং প্রখ্যাত শিক্ষাবিদগণ উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনে সর্বসম্মত ভাবে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রস্তাবে বলা হয় সর্বস্তরের শিক্ষাকে গ্রাম ও শহরাঞ্চলের আর্থিক বিকাশের জন্য সামাজিক ভাবে প্রয়োজনীয় উৎপাদনশীল কর্মসূচির মধ্য দিয়ে বাস্তবায়িত করতে হবে।

বুনিয়াদি শিক্ষার বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Basic Education) ঃ

বুনিয়াদি শিক্ষা সম্পর্কে গান্ধিজির ব্যাখ্যা ও পরবর্তী কমিটি এবং সম্মেলনসমূহে যেসব প্রস্তাব গৃহীত হয় তারই ভিত্তিতে বুনিয়াদি শিক্ষার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য উল্লিখিত হল—

(1) বুনিয়াদি শিক্ষা হল জীবনের জন্য শিক্ষা এবং জীবনের মাধ্যমে শিক্ষা।

(2) হাত-পা-চোখ-কান ইত্যাদি দেহের সমস্ত অংশের অনুশীলন এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশ ঘটে।

(3) বুনিয়াদি শিক্ষার লক্ষ্য হল সমগ্র ব্যক্তিত্ব এবং চরিত্রের বিকাশ।

(4) বুনিয়াদি শিক্ষা হস্ত, হৃদয় ও আত্মার শিক্ষা।

(5) বুনিয়াদি শিক্ষার বৈশিষ্ট্য হল শিক্ষাকালীন উপার্জন।

(6) এই শিক্ষা কেবলমাত্র গ্রামের শিশু এবং গ্রামীণ উন্নতির জন্য নয়। শহরেও এই শিক্ষা একই ভাবে কার্যকারী।

(7) বুনিয়াদি শিক্ষা কেবলমাত্র ছাত্রদের জন্য নয়, তাদের অভিভাবকদের জন্যও। নারীশিক্ষা এবং হরিজনদের জন্য শিক্ষাও এর অন্তর্ভুক্ত।

(8) বুনিয়াদি শিক্ষার চারটি স্তর আছে ;

(ক) প্রাক্‌বুনিয়াদি স্তর (7 বৎসরের পূর্ব পর্যন্ত)।

(খ) জুনিয়র বুনিয়াদি স্তর (7 থেকে 10 বৎসর পর্যন্ত)।

(গ) সিনিয়র বুনিয়াদি স্তর (11 থেকে 14 বৎসর পর্যন্ত)।

(ঘ) বুনিয়াদি-উত্তর স্তর (14 বৎসরের অধিক)।

(9) কোনো একটি শিল্পকে কেন্দ্র করে, শিশু সক্রিয়তার মাধ্যমে নানা বিষয়ে শিক্ষালাভ করবে।

(10) যে শিল্পকে বেছে নেওয়া হবে তা স্থানীয় পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে।
(11) এ শিক্ষা হবে বাধ্যতামূলক এবং অবৈতনিক।
(12) মাতৃভাষা হবে শিক্ষার মাধ্যম।
(13) এখানে দৈহিক শ্রম ও জ্ঞানের সমন্বয় হবে।
(14) শিক্ষার্থীর উৎপাদিত দ্রব্যের বিক্রয়লব্ধ অর্থ থেকে শিক্ষকদের বেতন দেওয়া হবে।
(15) স্বাস্থ, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, নাগরিকত্ব, খেলাধুলা, বিনোদন ইত্যাদির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হবে।
(16) শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন হবে অভ্যন্তরীণ। দৈনন্দিন কার্যাবলির ভিত্তিতে মূল্যায়ন হবে, বাহ্যিক মূল্যায়নের প্রয়োজন নেই।
(17) যতটা সম্ভব পাঠ্যপুস্তক পরিহার করা হবে।

বুনিয়াদি শিক্ষা-পরিকল্পনার উপযোগিতা (Importance of the Planning of Basic Education) ঃ

(i) ভারতবর্ষের মতো দেশের পক্ষে এই ধরনের শিক্ষা-পরিকল্পনা খুবই প্রয়োজনীয়। দেশে সর্বজনীন বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার জন্যও এই পরিকল্পনা প্রয়োজনীয়। Zakir Hussain Committee-র মতে "We consider the scheme of basic education to be sound in itself. It should be accepted as a matter of sound educational policy and as an urgent measure of national reconstruction." অর্থাৎ বুনিয়াদি শিক্ষা স্বয়ং শক্তিশালী পরিকল্পনা। জাতির পুনর্গঠনে অত্যন্ত জরুরি এবং শক্তিশালী শিক্ষানীতির ভিত্তিতে এটি গঠিত।

(ii) অর্থনৈতিক দিক থেকেও এটি কার্যকারী। কারণ এটি আর্থিক স্বনির্ভরতার নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। তাছাড়া এই শিক্ষা-পরিকল্পনা জাতীয় অর্থনীতির পুনর্গঠনে সহায়তা করে।

(iii) এই ধরনের শিক্ষা গণতান্ত্রিক ও সামাজিক। এখানে শ্রেণিভেদ ও জাতিভেদ প্রথা নেই। তাই এটি জাতীয় সংহতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়।

(iv) এটি শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সম্প্রদায়ের বিভেদ দূরীকরণে সহায়তা করে। শুধু তাই নয়, এটি কায়িক পরিশ্রমের সঙ্গে বৌদ্ধিক কাজের দূরত্ব দূর করে এবং ধনী-দরিদ্র ও গ্রাম-শহরের দূরত্ব দূর করে।

(v) এই শিক্ষা-পরিকল্পনা সক্রিয়তাভিত্তিক নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত যা সম্পূর্ণভাবে আধুনিক ও মনোবিজ্ঞানসম্মত।

(vi) বুনিয়াদি শিক্ষা বিদ্যালয় এবং সমাজের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনে সহায়তা করে।

(vii) এটি সম্পূর্ণ ভাবে শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক।

(viii) এটি আমাদের দেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। বুনিয়াদি শিক্ষা-পরিকল্পনা শিক্ষার্থীর সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়।

(ix) এই শিক্ষা-পরিকল্পনা সৃজনাত্মক এবং শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়।

(x) এটি নাগরিকতার শিক্ষা দেয়। শিক্ষার্থীদের দায়িত্বশীল ও কর্তব্যপরায়ণ করে তোলে।

বুনিয়াদি শিক্ষার ত্রুটি (Demerits of Basic Education) ঃ

বুনিয়াদি শিক্ষার একাধিক উপযোগিতা থাকা সত্ত্বেও তা সার্থক হতে পারেনি, কারণ এই শিক্ষাকে সঠিকভাবে রূপায়ণের চেষ্টা করা হয়নি। বুনিয়াদি শিক্ষা-পরিকল্পনার ব্যর্থতার একাধিক কারণ রয়েছে। যেমন—

(i) এই শিক্ষার রূপায়ণে শিক্ষক, সামাজিক নেতা এবং শিক্ষা প্রশাসক সকলেরই উদাসীনতা দেখতে পাওয়া যায় এবং আরও মনে করা হয় যে এই ধরনের শিক্ষা পরিকল্পনা বিদ্যালয়কে ক্ষুদ্র শিল্পের প্রতিষ্ঠানে পরিণত করে দেবে। শিক্ষার্থীরাও অর্থ উপায়ের যন্ত্র হয়ে উঠবে এবং শিক্ষাক্ষেত্র সম্পূর্ণভাবে অস্বাস্থ্যকর হয়ে উঠবে।

(ii) এই শিক্ষা-পরিকল্পনায় Liberal Education-কে একেবারে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। আবার অনেক সময় দেখা যায় শিল্পটিও ঠিকভাবে নির্বাচিত হয়নি।

(iii) এই শিক্ষা-পরিকল্পনা কখনোই জাতীয় শিক্ষা-পরিকল্পনার অংশ হয়ে উঠতে পারেনি, কারণ সমাজের মধ্যবিত্ত বা উচ্চবিত্ত শ্রেণির মানুষ এই শিক্ষা পরিকল্পনাকে নিম্নমানের বলে মনে করত।

(iv) কিছু মানুষ মনে করত সমাজের অর্থনৈতিক উন্নতি ও দ্রুত শিল্পায়নের জন্য সমাজের আধুনিকীকরণ ও দ্রুত পরিবর্তন প্রয়োজন। বুনিয়াদি শিক্ষা-পরিকল্পনা সেই প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম নয়। এর জন্য প্রয়োজন আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রয়োগ।

(v) এই শিক্ষা-পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য অর্থেরও যথেষ্ট অভাব ছিল।

(vi) এখানে যে শিল্প শিক্ষার কথা বলা হয়েছে তা ছিল সম্পূর্ণভাবে যান্ত্রিক, এর পেছনে কোনো বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি ছিল না। তাছাড়া এই ধরনের শিক্ষা পরিকল্পনার সময়-তালিকা নির্মাণ করাও খুব কঠিন।